সাতদিন

১৬ আগস্ট : তৈরি পোশাক শিল্প খাতের জন্য প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল করে দিয়েছে।

১৭ আগস্ট : অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ইউএনডিপি প্রশাসকের বৈঠকে বন্যার প্রকৃত ক্ষতি নিরূপণে বাংলাদেশ ও বৃহৎ দাতাদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি যৌথ সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১৮ আগস্ট : ফটিকছড়িতে র‌্যাবের সঙ্গে ওলমান বাহিনীর বন্দুকযুদ্ধে অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার ও ব্যাপক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

১৯ আগস্ট : সেমিস্টার পদ্ধতি সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে সাধারণ ছাত্র-পুলিশ ও ছাত্রদলের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে।

২০ আগস্ট : খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় পুলিশ-সন্ত্রাসী বন্দুকযুদ্ধে খুলনা জেলার পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (জনযুদ্ধ) কমান্ডার আলতাফ হোসেন (৩৮) ও তার সহযোগী রশিদ খোলদার (৩২) নিহত হয়েছে।

২১ আগস্ট : আওয়ামী লীগের সমাবেশে উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলায় ১৮ জন নিহত এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ ৫ শতাধিক আহত হয়েছেন।

২২ আগস্ট : বোমা হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল সারা দেশ। আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি করেছেন শেখ হাসিনা।

ডেট লাইন ২১ আগস্ট

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

গুলিস্তানের বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ অফিস। ২১ আগস্ট বিকেল তিনটা থেকেই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের মিছিল আওয়ামী লীগ অফিসে আসতে থাকে। সিলেটে বোমা বিস্ফোরণ ও গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আহূত এ সমাবেশ ও মিছিল কর্মসূচিতে যোগ দিতে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে কয়েক হাজার নেতা-কর্মী সমবেত হন। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে খোলা একটি ট্রাকে মঞ্চ করা হয়। কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যের পর বক্তব্য শুরু করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তার বক্তব্যের শেষে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি। সময় বিকেল ৫টা ২২ মিনিট। শেখ হাসিনা বললেন, 'বাংলার মানুষ শীঘ্রই এই দুঃশাসনের হাত থেকে রেহাই পাবে। সিলেটের বোমা হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।' বক্তব্য শেষ করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকট একটি শব্দ হলো। এরপর একের পর এক গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দ। শেখ হাসিনার পাশে থাকা আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর সভাপতি মোঃ হানিফ, সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, শেখ সেলিম শেখ হাসিনাকে ঘিরে ধরে মানব ব্যূহ রচনা করলেন। ট্রাক থেকে দ্রুত নামিয়ে পাশে রাখা বুলেটপ্রুফ গাড়িতে তুলে দেয়া হয়। শেখ হাসিনাকে এ সময় আগলে রাখলেন দেহরক্ষী মাহবুব আলম বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এ সময় শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেডের সঙ্গে গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। শেখ হাসিনাকে আগলে রেখে গাড়িতে তুলে দেয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে মারা গ্রেনেডটি এসে লাগে মাহবুবের শরীরে। নেত্রীকে গাড়িতে তুলে দিয়েই লুটিয়ে পড়েন তিনি রাস্তায়। তখন বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শত শত আহত মানুষের গগনবিদারী আর্তচিৎকার। রাস্তায় রক্ত, খসে পড়া মাংস, গ্রেনেডের অংশ। রাস্তায় পড়ে আছে রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন অগণিত মানুষ। এ সময় মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, কাজী জাফরউল্লাহ, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ওবায়দুল কাদেরকে। গ্রেনেড বিস্ফোরণের জায়গায় পড়ে রয়েছে ৫/৬টি রক্তাক্ত নিথর দেহ। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের দিকে রাস্তায় পড়ে ছিলেন আইভি রহমানসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ মহিলা কর্মী। আইভি রহমানের সারা শরীর থেকে বিদ্যুৎবেগে রক্ত বের হয়ে রাস্তা ভেসে যাচ্ছিল। তার সামনেই একটি গ্রেনেড দেখা যায়। রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় কয়েকজন সাংবাদিক, ফটো-সাংবাদিককে। সমাবেশে উপস্থিত হতভম্ব আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা কিছুক্ষণ পরেই আহতদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এ সময় পুলিশ স্টেডিয়ামের

দিক থেকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চ্যানেল আইয়ে আহত সাংবাদিক আশরাফুল আলম খোকন বলেন, 'আমার মনে হয়েছে ওপরের কোনো ছাদ থেকে গ্রেনেডগুলো ফেলা হয়েছে। নেত্রীকে আঘাত করতে পারে এমনভাবে। গ্রেনেডের আঘাতে আমি পড়ে যাই। শুধু চিৎকার শুনতে পাই।

পুলিশের টিয়ার গ্যাস উপেক্ষা করেই আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা আহতদের হাসপাতালে পাঠাতে থাকেন রিকশা, ভ্যান, প্রাইভেট কারযোগে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি মোটরসাইকেলে করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মহীউদ্দীন খান আলমগীর ও কাজী জাফরউল্লাহকে একটি ভ্যানে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে আসা মাইক্রোবাস, অ্যাম্বুলেন্সে চলতে থাকে উদ্ধার তৎপরতা। সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গিয়ে দেখা যায় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। গ্রেনেডে আহত মানুষের চিৎকার। আর অসংখ্য মানুষের ভিড়। খবর পেয়ে স্বজনরা হাসপাতালে ছুটে আসছে। ভ্যান, মাইক্রোবাস, অ্যাম্বুলেন্সে আসছে আহতরা। ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সি থেকে তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ সময় ঢাকা মেডিকেলের চারদিকের রাস্তা থেকে শুধু অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দই ভেসে আসতে থাকে। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় শিকদার মেডিকেল, পঙ্গু হাসপাতাল, শমরিতা, বারডেমসহ শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে।

সময় যতই গড়াতে থাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাড়তে থাকে আহতের সংখ্যা। ভিড় ঠেলে মেডিকেলের ৩২ নং ওয়ার্ডে যেতেই শোনা গেল শুধু আহত মানুষের চিৎকার। ঐ ওয়ার্ডে ঢোকার দরজার সামনেই পড়ে আছে শেখ হাসিনার দেহরক্ষী মাহবুব আলমের নিথর দেহখানি। নিজের জীবন দিয়ে তিনি নেত্রীর জীবন রক্ষা করে গেলেন। ৩২ নং ওয়ার্ডে ঢুকে দেখা গেলো বীভৎস সব দৃশ্য। গ্রেনেডে কারো হাতের আঙুল নেই, কারো পিঠের মাংস উড়ে গেছে। কেউ চিৎকার করছে মাগো-বাবাগো বলে। ২/৩ জন ডাক্তার, নার্স সেবা দেয়ার চেষ্টা করলেও আহতের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। এ সময় ৩২ নং ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মাঝে মাঝে সাংবাদিকদের কাছে মৃত্যুর সংবাদ আসতে লাগলো। বাড়তে থাকলো গ্রেনেডের আঘাতে মৃতের সংখ্যা। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে মারাত্মক আহত হয়ে এসেছেন আওয়ামী লীগ কর্মী আকবর। তিনি জানালেন, নেত্রীর খুব কাছে থেকেই তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তিনি বলেন, 'হঠাৎ দেখি ওপর থেকে আগুন আসছে। প্রচন্ড শব্দ। আমি শুয়ে পড়ি। চিৎকার, চেঁচামেচি শুনতে পাই। অনেকে আমার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালায়। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আমি নিজেই ওঠার চেষ্টা করি। দেখি আমার সারা গা ঝলসে গেছে। এ অবস্থা দেখে আমি ভেবেছিলাম নেত্রী বুঝি বেঁচে নেই।'

সারা রাত ধরে ঢাকা মেডিকেলসহ বিভিন্ন হাসপাতালে আহতরা জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে থাকেন। হাসপাতালে রাতেই মৃতের সংখ্যা ১০-এ দাঁড়িয়ে যায়। আওয়ামী লীগ কর্মী ও স্বজনেরা সারা রাত হাসপাতালে কাটান। কখনও তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আচরণে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। রাতে হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অবস্থান নেয় পুলিশ-বিডিআর।

২২ আগস্ট সকাল থেকে নিহতদের স্বজনেরা লাশ নেয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে অপেক্ষা করতে থাকেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে কালক্ষেপণ করতে থাকে। অপেক্ষার পালা যেন আর শেষ হয় না। অবশেষে রাত সাড়ে আটটায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে ২১ আগস্টের বর্বরতা আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলো যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ভবিষ্যতের দিকে। সভ্য জগতে এমন নিষ্ঠুরতা কল্পনাও করা যায় না। দেশের গণতন্ত্র ও মানবতার জঘন্য অপরাধীদের চিহ্নিত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের নির্মূল করতে হবে।

আতঙ্কের নগরী ঢাকা

ঢাকা শহর আতঙ্কিত নগরীতে পরিণত হয়েছে। গত ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে বর্বরোচিত হামলার পর পাল্টে যায় ঢাকার দৃশ্যপট। ঘটনার নিষ্ঠুরতায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে নগরবাসী। সর্বত্র এখন চাপা উত্তেজনা। বাতাসে নানা গুঞ্জন। সারা ঢাকা শহরের বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ মিছিল করে চলছেন। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার ভাঙচুর চলছে। রাজধানীর সর্বত্র পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন জোরদার করা হয়েছে। টহল পুলিশ শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমা হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে ২১ আগস্ট সন্ধ্যার পর থেকে রাজধানী পরিবহনশূন্য হতে থাকে। মৃতের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও বেড়ে যায়। ঢাকায় অঘোষিত এক কার্ফ্যুর পরিবেশ বিরাজ করে। রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে আহত মানুষের আত্মীয়স্বজনের আহাজারিতে অমানবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গত ২২ আগস্ট রাজধানী পরিণত হয় গুজবের নগরীতে। উৎসুক জনতা পত্রিকা অফিস, সাংবাদিকদের কাছে মোবাইল ফোন করে গুজবের সত্যতা জানতে চান। পুলিশ পল্টন ময়দানে আবারও গুলি চালিয়েছে কি না তাও জানতে চান। সিএমএইচে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ নেত্রী বেঁচে আছে তো। রাতে কি কার্ফ্যু জারি হচ্ছে। গুলিস্তান এলাকায় এখন কার্ফ্যু চলছে কি না? এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শহরে আতঙ্ক বিরাজ করছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন রয়েছে। রাজধানীতে এখন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। চলছে বোমা মেরে বিভিন্ন স্থান উড়িয়ে দেয়ার হুমকি। শামসুন্নাহার, রোকেয়া হল টেলিফোনে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। পত্রিকা অফিসও উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে টেলিফোনে । আওয়ামী লীগ লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণায় নগরবাসীকে আরো ভাবিয়ে তুলছে। স্থবির হয়ে উঠছে নগরাসীর অর্থনৈতিক কার্যক্রম। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে নৃশংস্য হত্যাযজ্ঞের প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। দেশের গণতন্ত্র ও মানবতার এ জঘন্যতম অপরাধীর বিরুদ্ধে সর্বত্র ধিক্কার দেয়া হচ্ছে।

ওসমান ইন্টারলাইনিংস

কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকি

রিপোর্ট **মামুন রহমান**

সাভারের গণকবাড়িতে অবস্থিত মেসার্স ওসমান ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড শুরু থেকেই প্রতারণার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষের প্রতারণার কারণে অন্তত ৩শ' লোক কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক সহায়তায় ঐ প্রতিষ্ঠানটি সীমাহীন অনিয়ম করেও এতদিন পার পেয়ে গেছে। কিন্তু তাদের শুভঙ্করের ফাঁকি দেরিতে হলেও ফাঁস হয়ে গেছে। ধরা পড়ে গেছে সব প্রতারণা। কাস্টমসের শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত করে জানতে পেরেছে, পুরো ভুয়া তথ্যের ওপর ভর করেই প্রতিষ্ঠানটি চলছে। আর এ পর্যন্ত তারা শুধু শুল্কই ফাঁকি দিয়েছে অন্তত ৫ কোটি টাকার। বিষয়টি জানতে পেরে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন প্রতিষ্ঠানের মালিক সাইদুল ইসলাম। অভিযোগ উঠেছে, তার দৌড়ঝাঁপের কারণেই তদন্ত কাজ শ্লথ হয়ে গেছে। যেভাবে তদন্ত কাজ এগুনোর কথা ছিল সেভাবে এগুচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, ২০০২ সালের ১৩ মে মেসার্স ওসমান ইন্টারলাইনিং লিমিটেড বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোনস অথরিটির কাছ থেকে বিইপিজেড-এ ইন্টারলাইনিং প্রস্তুতকারক কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়। এরপর একই বছরের ৬ নবেম্বর তাদের সেমি ফিনিশড্ ইন্টারলাইনিং আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। বিইপিজেডের অনুমোদনপত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করে স্থাপন করতে বলা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ধরা হয় ৬ লাখ ৯১ হাজার ১১৩ মার্কিন ডলার। কিন্তু শুল্ক গোয়েন্দারা তদন্ত করে দেখতে পেয়েছেন অদ্যাবধি সেখানে কোনো নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়নি। তদন্ত টিম প্রতিষ্ঠানটিতে মাত্র ৩টি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ও অকেজো ডাইকাটিং, স্মুথিং ও কাটিং মেশিন দেখতে পান। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারলাইনিং ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্ত হলেও তারা ইন্টারলাইনিং তৈরির কাঁচামাল আমদানির পরিবর্তে সরাসরি ইন্টারলাইনিং আমদানি করছে। এ ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনধর্মী হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্ত। শুল্ক বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, রহস্যজনকভাবে ওসমান ইন্টারলাইনিং লিঃকে ইন্টারলাইনিং উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানির অনুমোদন না দিয়ে ৫ প্রকারের ইন্টারলাইনিংসহ অন্তত ৪০ প্রকারের তৈরি পণ্য আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। যা বাস্তবসম্মত নয়। যদি ধরেই নেয়া যায় প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুত আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছে তাহলেও তারা কাঁচামাল ছাড়া তৈরি পণ্য আনতে পারেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মূলত মোটা অঙ্কের অর্থ ছড়িয়েই প্রতিষ্ঠানটি শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের ঐ সূত্রটির মতে, সবকিছু বাদ দেয়া হলেও শুধু মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি গত দেড় বছরে অন্তত ৫ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে। তাদের কারণে কাঁচামাল আমদানি করে যারা ইন্টারলাইনিং তৈরি করছে তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ অধিক খরচ হওয়ার কারণে তারা ওসমান ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করছে তারা তা পারছে না। সূত্রমতে, একই মালিকের আরো ২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলোও চলছে শুভঙ্করের ফাঁকির ওপর। তাদের জোচ্চুরির কারণে অন্তত ৩শ' লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এতে সরকার হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব। অপরদিকে স্থানীয়ভাবে যারা ঐ পণ্য তৈরি করছে তারা ব্যবসায় মার খাচ্ছে। এ ব্যাপারে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত সাপেক্ষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্টও পেশ করেছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে যে গতিতে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা তা হচ্ছে না। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দু'হাতে টাকা উড়িয়ে তাদের দুর্নীতি ঢাকতে চাচ্ছেন। এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা দ্রুত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

বন্যার্তদের জন্য নেস্‌লে বাংলাদেশ

নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড বন্যার্তদের জন্য ৩০ লাখ টাকার সহায়তা প্রদান করেছে। গত ২২ আগস্ট নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কারলো চিফিএলো ১০ লাখ টাকার একটি চেক প্রধানমন্ত্রীর বন্যা সহায়তা ফান্ডে প্রদান করেন। এর মধ্যে নেস্‌লের

Rbve Kv‡jv wPwdG‡jv, g¨v‡bwRs wW‡i±i- †bm‡j evsjv‡`k wjwg‡UW, 10 jvL UvKvi GKwU †PK  gvbbxq cavbgš¿x †eMg Lv‡j`v wRqv‡K n¯ÍvšÍi K‡ib| cv‡k wnDg¨vb wi‡mv‡mm GÛ K‡cv‡iU G¨v‡dqvm wW‡i±i Gg Rj wdKvi †nv‡mb

সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর স্বেচ্ছা প্রদত্ত একদিনের বেতন অর্ন্তভুক্ত ছিলো। এছাড়াও নেস্‌লে বাংলাদেশ বন্যার্তদের সাহাযার্থে সারাদেশে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ২০ লাখ টাকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে ছিলো সিরিয়াল বেইসড সুষম খাদ্য, নুডুল্‌স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা এবং জরুরি আর্থিক সাহায্য প্রদান। এই সব খাদ্যসামগ্রী সারাদেশে প্রায় ১৮০০০ বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। নেস্‌লে বাংলাদেশ, নেস্‌লে এস এ সুইজারল্যান্ডের একটি পূর্ণমালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। বাংলাদেশে নেস্‌লে এখন পর্যন্ত ১১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ঢাকা থেকে ৫৫ কি. মি. উত্তরে শ্রীপুরে নেস্‌লের কারখানায় নুডুল্‌স ও সিরিয়াল উৎপাদিত হয় এবং মিল্ক, স্যুপ, বেভারেজ ও বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী প্যাকেটজাত করা হয়।

শেরপুরের বন্যহাতি

চলছে শুধু ধারণাভিত্তিক আলোচনা

রিপোর্ট : **আসাদুর রহমান**

১০০ হাতি নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি বাংলাদেশ। দেশের শেরপুর, জামালপুর এলাকার সীমান্ত অঞ্চলে আটকেপড়া হাতিগুলো ভুগছে খাদ্য সংকটে। ফলে সেগুলো প্রায়ই লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। ধ্বংস করছে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি। হাতির আক্রমণে কখনো জীবন হারাচ্ছে স্থানীয় জনগণ।

ধারণা করা হচ্ছে, গত প্রায় ৩ বছর ধরে ভারতের মেঘালয় বনাঞ্চলের প্রায় ১০০ হাতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে আটকা পড়ে গেছে। হাতিগুলো যখন বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থান করছিল তখন ভারত সরকার সীমান্ত এলাকায় হাইওয়ে নির্মাণ করে। সেই হাইওয়েতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। ফলে হাতিগুলো তাদের চলাচলের চেনা পথটি হারিয়ে ফেলে।

তবে এসব ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। দাবি করা হচ্ছে, হাতিগুলো ভারতীয়। ভারত সরকার যেন এগুলোর ফিরিয়ে নেয়। এ দাবি এ দেশের প্রাণী বিজ্ঞানী ও বন কর্মকর্তাদের। কিন্তু কোনো ভিত্তি ছাড়া এ দাবি নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠেছে।

সবচেয়ে বড় সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে 'ভারতীয় হাতি' কথাটিকে কেন্দ্র করে। কারণ বন্যপ্রাণীর কোনো নির্দিষ্ট আবাসভূমি নেই। বিশেষ করে হাতির ক্ষেত্রে কথাটি খুবই প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে আইইউসিএন-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ড. আইনুন নিশাত সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এই হাতিগুলোর মূল আবাসস্থল ভারতে। হাতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় সে জানে কোথায় কোন খাবার পাওয়া যায়। ১০ বছর আগে সে কোথায় খাবার পেয়েছে তা তার মনে থাকে। ৭০-এর দশকে বাংলাদেশের এ অঞ্চলে ঘন বন ছিল। ৫-৭ মাইল জুড়ে ছিল এ বন। তখন হাতিগুলো এখানে আসতো। সে সূত্র ধরেই হয়তো তারা আবার এখানে এসেছে। তাই বলা যায়, এ বনটিও তাদের আবাসস্থলের একটি অংশ ছিল।'

ড. আইনুন নিশাতের বক্তব্য অনুযায়ী, আমরা কখনোই বলতে পারি না হাতিগুলো ভারতীয়। বলা যায়, এই হাতিগুলোর আবাসস্থল বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায়। আর তাই যদি সত্যি হয়, হাতিগুলো ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দাবি একেবারেই অবান্তর। কিন্তু আজ সে দাবিই তুলছেন বাংলাদেশ বন বিভাগের কর্মকর্তারা।

এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল ময়মনসিংহের জেলা বন কর্মকর্তা আব্দুল লতিফ মিয়ার সঙ্গে। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে সরাসরি জানিয়ে দেন, হাতিগুলো ভারতের মেঘালয় বনাঞ্চলের। তিনি বলেন, 'আমাদের এ বর্ডার এলাকায় হাতি ছিল না। মেঘালয়ের বনাঞ্চলে গাছপালা নেই। আমাদের এদিকে রয়েছে। তাই হাতিগুলো জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা বর্ডার দিয়ে এ দেশে ঢুকে পড়ে। এরা ধান ক্ষেত নষ্ট করে। বাড়িঘর ভাঙচুর করে।' হাতিগুলো সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করছেন তার কিছু অংশ সত্যি হলেও বাকিটা একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ হাতিগুলো যে এ দেশের নয়, সে সম্পর্কে কোনো স্টাডি এখনো বাংলাদেশ বন বিভাগ করে দেখেনি।

প্রাণী বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই হাতিগুলো ভারতের মেঘালয় আর বাংলাদেশের জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনার সীমান্তবর্তী এলাকায় চড়ে বেড়াতো। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের এ অঞ্চলের বনাঞ্চলের ওপর চড়াও হয় দেশের স্বার্থান্বেষী মহল। এখানে ছিল দু'ধরনের জমি-সরকারি খাস ভূমি আর বন বিভাগের বনভূমি। কিন্তু এর কোনোটাই একসঙ্গে ছিল না। টুকরো টুকরো অবস্থায় বন বিভাগ ও সরকারি খাস জমিগুলো ছিল। সরকারি জমিগুলো দরিদ্র ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এরা যখন থাকার জমি পেল তখন তাদের চোখ পড়লো পাশের বন বিভাগের জমিগুলোর ওপর। স্থানীয় কুচক্রিমহলের সহায়তায় পাশের বনভূমিটিকেও তারা দখলে নেয়া শুরু

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

করলো। আর এভাবেই শেষ হয়ে গেলো এ অঞ্চলের বনভূমি।

যখন এ অঞ্চলের বনভূমিগুলো শেষ হয়ে যেতে লাগলো তখন ধীরে ধীরে হাতিগুলো সরে যেতে লাগলো ভারতের মেঘালয়ের দিকে। তারা ভুলে যায়নি তাদের পুরনো আবাসভূমিকে। বেশ কিছুদিন পর তারা আবারও ফিরে এসেছে তাদের এদিকের আবাসভূমিতে। কিন্তু তারা দেখছে, এখানেও বনভূমি নেই। যে এলাকায় তারা চড়ে বেড়াতো সেখানে গড়ে উঠেছে বাড়িঘর। তাই তারা বাড়িঘর ভাঙচুর করছে। বনাঞ্চলের খাবার না পেয়ে সাবাড় করছে জমির ধান।

বাংলাদেশ বন্য প্রাণীতত্ত্ব সমিতির সভাপতি অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে মানুষ আর হাতি দু'জনই অসহায়। হাতিগুলো খাবারের অভাবে বেপয়ারা হয়ে উঠছে। ফলে সে মানুষের ক্ষতি করছে। অন্যদিকে লোকজনও হাতির ভয়ে অস্থির, শুনেছি অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

হাতিগুলো যে এখানে আটকা পড়ে গেছে সে বিষয়েও অনেকে নিশ্চিত নয়। কেননা মায়ানমার থেকে বন্য হাতি চুনতি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে আসা যাওয়া করে। তাদের আসা যাওয়ার পথে রয়েছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক, যানবাহন চলাচলের জন্য হাতিগুলো রাস্তা পারাপারের সময় বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তার পরও তারা চলাচল করছে। কিন্তু ওপারে ভারত যদি হাইওয়ে নির্মাণ করে তবে কেন শেরপুরের হাতিগুলো মেঘালয়ে আসা যাওয়া করতে পারবে না। আর সে জন্যই হাতিগুলো বাংলাদেশ এলাকায় আটকা পড়েছে নাকি অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেক প্রাণী বিজ্ঞানীর ধারণা, হয়তো অন্য কোনো সমস্যার জন্য হাতিগুলো চলাফেরা করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে কাজী জাকের হোসেন বলেন, 'হাতিগুলোর কি সমস্যা হচ্ছে, কেন তারা মানুষকে আক্রমণ করছে সেটা খুঁজে বের করা উচিত। তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে এদের নিয়ে কি করা যায়।'

nwZ, ‡j v wb‡q hv fvev n‡"Q Zvi meB ধারণাভিত্তিক, মাঠপর্যায়ে এদের নিয়ে কোনো কাজ এখন পর্যন্ত কেউই করেনি। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, আইইউসিএন, ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট হাতিগুলো নিয়ে একটি আলোচনা সভা করে। যেখানে আইইউসিএন একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করে। তবে সেটাও মাঠ পর্যায়ের কাজ থেকে নয়, স্থানীয় জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতেই এই সুপারিশমালা গঠন

মায়ানমার থেকে বন্য হাতি চুনতি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে আসা যাওয়া করে। তাদের আসা যাওয়ার পথে রয়েছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক, যানবাহন চলাচলের জন্য হাতিগুলো রাস্তা পারাপারের সময় বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তার পরও তারা চলাচল করছে। কিন্তু ওপারে ভারত যদি হাইওয়ে নির্মাণ করে তবে কেন শেরপুরের হাতিগুলো মেঘালয়ে আসা যাওয়া করতে পারবে না

করা হয়। এতে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রথমত, একটি বায়োলজিক্যাল করিডর তৈরি করতে হবে। যা দিয়ে হাতিগুলো ভারত-বাংলাদেশের আবাসস্থলগুলোতে যাওয়া-আসা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে যতটুকু তাদের আবাসস্থল রয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে। এই এলাকাকে আবার বনভূমিতে পরিণত করতে হবে। এবং সেখানে স্থানীয় জাতের গাছ ও হাতির পছন্দনীয় খাবার গাছগুলো লাগাতে হবে। তাছাড়া একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে বনভূমি ও খাসজমিগুলোকে আলাদাভাবে নির্ধারণ করতে হবে। তৃতীয়ত, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

তবে এ হাতিগুলো নিয়ে এ দেশে গড়ে উঠতে পারে ইকো-ট্যুরিজম। এ প্রসঙ্গে আইনুন নিশাত বলেন, 'আমরা এই হাতিগুলো নিয়ে ইকো-ট্যুরিজমের ব্যবস্থা করতে পারি। গজনিতে যে সেন্টারটি রয়েছে আমরা সেরকমের যদি কিছু ওয়াচ টাওয়ার করতে পারি। বুনো হাতি দেখা যাবে সেখানে। অবশ্যই সেখানে ট্যুরিস্ট আকৃষ্ট হবে। এবং সেটা হয়ে দাঁড়াবে স্থানীয় জনগণের অতিরিক্ত আয়ের উৎস।' তিনি আরো বলেন, 'ভারতের ভরতপুরে সেচের পানি আটকে সেখানে বার্ড স্যাংচুয়ারি তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজনকে পাখির পরিচিতি বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। তারা ট্যুরিস্টদের পাখিগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। গম লাগিয়ে তারা যা আয় করতো এ কাজে তারা আজ আরো বেশি আয় করছে।'

যা হোক, বর্ডারের এই এলাকার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এ মুহূর্তে প্রয়োজন এই হাতিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার। সেই ব্যবস্থাপনা কি হবে সেটা ঢাকায় বসে সিদ্ধান্ত নিলে হবে না। হাতিগুলোর কি সমস্যা হচ্ছে, ওদের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন তা নির্ণয়ের জন্য মাঠপর্যায়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিষয়টি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের আলোচনার টেবিলে বসা। যত দ্রুত এ বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করা যাবে ক্ষয়ক্ষতি ততই কম হবে।